ধর্ষণ শাসকের কালচার, শাসকের হাতিয়ার

মধুময় পাল

'... দুর্যোধন কর্ণের দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সরিয়ে কদলীকাণ্ডতুল্য তাঁর বাম উরু দ্রৌপদীকে দেখালেন।'
মহাভারত, সভাপর্ব। সারানুবাদ: রাজশেখর বসু

সাল ১৯৫২। মাস জুন কিংবা জুলাই। রোদ-বৃষ্টি ছিল তীব্র কষ্টকর। তারিখ স্মরণে নেই আমার মা নীহারকণার। মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য বাঙালি হিন্দুরা দলে দলে পিতৃমাতৃধাত্রীভূমি পুববাংলা ছেড়ে পালাচ্ছেন তখন। যৌথ সুখে দুঃখে বহুকালের নিকট পড়শিরা যে ভেতরে ভেতরে এতটা পিশাচপ্রবৃত্তি জমিয়ে রেখেছিল কে জানত! তাদের যাবতীয় লালসা ও খুনের নেশা যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, পালাও। পুববাংলার হিন্দুদের কাছে তখন সব তারিখই বাস্তু থেকে উৎখাত হওয়ার তারিখ, পালিয়ে বাঁচার তারিখ। দৈবে বিশ্বাস নেই, তবু বলতে হয়, আমার মা বেঁচেছিলেন দৈবক্রমে। তাঁরই মতো পলায়নপর একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন আনসার। তাঁরই পাশ থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি তারা। মেয়েটির বডি সার্চ হবে। কয়েক ঘণ্টা পর তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রায়-বিবস্ত্র রক্তাক্ত বডি। না, তখনও মরেননি, হাত নাড়ছিলেন সেই ধর্ষিতা, হয়তো দেশভাগের নেতাদের প্রতি অভিবাদনে, অথবা, ট্রেনভরতি হাজাব হাজার জনতার নির্বীর্যতাকে অভিনন্দিত করে।

কর্ণ বললেন, শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করেছেন। দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ কর। পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপহার। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই কৃষ্ণা দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও। রাজনন্দিনি! তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজার পরিবারবর্গের সেবা কর; শাস্ত্রানুমোদিত সেই কার্য্যই তোমাকে আদেশ করিতেছি। এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাই তোমার প্রভু, পাণ্ডবেরা নহে। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ এবং আরও আরও সভাস্থ কুরুবীর ও কুরুবৃদ্ধেবা বেবাক নিশ্চুপ। ধৃতরাষ্ট্রের হোমগৃহে উচ্চস্বরে শেয়াল ডেকে উঠল। সেই শব্দ লক্ষ করে গাধা ও ভয়ঙ্কর পাখিরা ডাকতে শুরু করল।

মহাভারতে দ্রৌপদীর 'বডি সার্চ' শেষ পর্যন্ত হয়নি, যদিও অপমান ও নির্যাতন চরম স্তরেই পৌঁছেছিল। খণ্ডিতভারতে নীহারকণার সহযাত্রিণী, দেশভাগের শর্তে দেশহারা মেয়েটি 'ভাগের পয়মাল' বলে বিবেচিত হন। আনসাররা তাঁকে দেশনেতাদের খেলার বিবরণ ও নিয়মকানুনের সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতি নিয়ে জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি, পরাজিত বিপক্ষ হিসেবে অধিকার করেছিল। দ্রৌপদী রাজনন্দিনী, রাজবধূ। ধর্ষিত না হয়েও এক অর্থে ধর্ষিত, কদলীকাণ্ডতুল্য বাম উরু দেখিয়ে নারীকে পুরুষের যৌন ইশারা জানানো শ্লীলতাহানি। এর জন্য দায়ী ছিল ক্ষমতার জুয়া। সূতপুত্রকে দ্রুপদ-কন্যার কবেকার প্রত্যাখ্যানের জ্বালা এই তালে মিটিয়ে নিয়েছিল কর্ণ। সেটাও তো ক্ষমতারই লীলা! পুববাংলার দেশহারা মেয়েটি নিতান্ত সাধারণ ঘরের সন্তান। তাঁর কোনো দায় ছিল না দেশভাগে, দায় ছিল না দাঙ্গায়। ক্ষমতার জুয়া খেলায় তিনি গণধর্ষিত হয়েছেন।

বিজিতের প্রতি বিজয়ীর ব্যবহার এইরূপই হয়। বিজয়ীর পতাকার অন্যতম চিহ্ন ধর্ষণ।

এবং ধর্ষণের গায়ে থাকে সন্ত্রাসের উলকি।

দেশভাগের রাজনীতির অলাতচক্রে কত নারী দগ্ধ হয়েছেন, তার হিসেব কোনোদিন পাওয়া যাবে না। উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম ভারত জুড়ে আছে সন্ত্রাসে মেয়েদের পোড়ার কাহিনী, স্মৃতি, শ্রুত ও অশ্রুতকথা।

এই রাজনীতির কদর্য ইন্ধন ছিল ধর্মীয় উন্মাদনা। ধর্মও ধর্ষণে মদত দেয়! ধর্মকে সেই লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়।

একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গান্ধীবাদী সেবাকর্মী অশোকা গুপ্তের নোয়াখালির অভিজ্ঞতা থেকে: থানায় বহু কষ্টে এক স্বামী-স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিয়ে গেছি। যা ঘটছে তা বলো। এজাহার দাও। তখন বেশ রাত্রি হয়েছে, অতি সঙ্গোপনে আমার সঙ্গে বড়ো ঘোমটা দিয়ে স্ত্রী বলছে যে, দাঙ্গার দুই মাস পরেও প্রতিরাতে তাকে দুই-তিন জন জোর করে তুলে নিয়ে যায় এবং ভোররাতে ফেরত দিয়ে যায়। এরকম প্রত্যহ ঘটছে, কিন্তু ভয়ে স্বামী বা পরিবারের কেউ প্রতিবাদ করতে বা পুলিশের সামনে এজাহার দিতে সাহস পাচ্ছে না। থানার ওসি বলছেন, ঘটনা তো শুনলাম। নাম বলবে, পরিচয় বলবে, বিবৃতি সই করবে। তবে তো এজাহার হবে। মেয়েটি কেঁদে আকুল। বলে, আমাকে এই প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। স্বামী বলে, নাম বললে আমায় কেটে ফেলবে। তার চেয়ে দেশ ছেড়ে পালাই। সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত ওই পরিবার দেশ ছেড়ে পালাতেই বাধ্য হল।

নোয়াখালিতে ধর্মের নামে সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অন্তত ৫০ হাজার হিন্দু নরনারী। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুর সন্ত্রাস। কিন্তু এই সন্ত্রাস থেকে তেমন লাভবান হতে পারেননি গরিব মুসলমানরা। ব্যাপক লুটতরাজ হয়েছে ধনী হিন্দুদের বাড়িতে। লুটের মাল যায়নি গরিব মুসলমানের ঘরে। এটা ধর্মীয় দলতন্ত্র, যা মুসলিম লিগের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। মুসলিম লিগ সরকার এক সপ্তাহ গণ-নির্যাতনের খবর চেপে রাখে। নোয়াখালিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান নিশ্চয় ছিলেন একতরফা উৎপীড়নের সেই হিংসাজর্জর সময়ে। কিন্তু দলতন্ত্রের হিংস্র কর্কশ উৎকট

চিৎকারের সামনে তাঁদের স্বর নিষ্প্রভ হয়ে যায়, যেমন হয়েছিল দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণ ও তাদের আমচা-চামচাদের খ্যা খ্যা আলোড়িত কৌরবসভায়, যেমন হয়েছিল রাষ্ট্রীয় উর্দির আনসারদের উদ্ধত লালসা-তাড়িত ব্যবহারের সামনে। ধৃতরাষ্ট্রের হোমগৃহে উচ্চস্বরে শেয়াল ডেকে ওঠে। সেই শব্দ লক্ষ করে গাধা ও ভয়ংকর পাখিরা ডাকতে শুরু করে।

এই তিনটি ঘটনা— দ্রৌপদীর নিগ্রহ, দেশহারা মেয়েটিকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ধর্ষণ ও নোয়াখালির বধূটির প্রতিরাতে গণধর্ষিত হওয়া— রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নজির। শাসক দল ও প্রশাসনের যুগলবন্দি এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া বাংলার পূর্ব ভূখণ্ডে কীভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছড়ানো হয়েছিল, তার একটি উদাহরণ আছে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে। হিরণ্ময়বাবু শুনেছিলেন ভুক্তভোগীদের মুখে। পূর্ব পাকিস্তানে 'হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমন বয়সে প্রবীণ প্রৌঢ়ও আছে। দাঁড়িয়ে তারা নাকি ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গান গায় : — পাক পাক পাকিস্তান, আর অন্য পাড়ের লোক বলে, — হিঁদুর ভাতার মুসলমান। এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে, সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মনে তার সেই আচরণ ভারী কৌতুক বোধ জাগায়। তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলে: — ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চলল। আর দেরি কেন? এবার ঘরে চলো। সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই প্রৌঢ় মানুষটি এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলে, — ওরে, তোর চাচির পায়ে বুঝি খিল ধরেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না। ভদ্রলোক এখানেই কাহিনি শেষ করলেন। তারপর বললেন, এরপর আর দেশে থাকি কী করে। পালিয়ে আসি।' হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যের মুখে ঘটনাটি শুনেছেন। বিশ্বাস করতে দ্বিধা ছিল হয়তো। তাই 'নাকি' ব্যবহার করেছেন লেখার সময়। বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটেছিল হাজার হাজার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুক্ত থেকে গিয়েছে মেয়েদের সম্ভ্রমের স্বার্থে। ধর্মের অছিলায় বিভেদ ঘটিয়ে, শত্রুসম্পত্তির লোভ ও লালসায় তাড়িত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একটি অংশের মাধ্যমে এভাবেই সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে রাষ্ট্র। বহুকালের পরস্পরের চেনারা হঠাৎ হয়ে যায় অচেনা। বন্ধু আর বন্ধু থাকে না। মানবিক সম্পর্কগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। রাষ্ট্রের স্নেহে সেই একাংশ পিশাচ হয়ে ওঠে। শুভবুদ্ধির অস্তিত্ব কার্যত অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে, কোথাও বিপন্ন।

২

সামান্য ঘটনা, টানাহ্যাঁচড়া, ধস্তাধস্তি এবং বাড়াবাড়ি

দ্বিজাতিতত্ত্ব-দেশভাগ-স্বাধীনতার অন্ধ উন্মাদনাপূর্ণ দিনগুলিতে যা ঘটেছিল, তার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি ব্যবধানে, যখন পরিস্থিতি দৃশ্যত স্বাভাবিক, পূর্ব পাকিস্তান আর নেই, গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। হাসান মামনের লেখা থেকে এর সমর্থনে অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি-কর্মী ওয়াহিদুল হক পূর্ণিমারানি শীল নামে এক ধর্ষিত কিশোরীকে দেখতে ও তার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়েছিলেন কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। সেই সঙ্গীদের একজন হাসান মামুন। তিনি লিখছেন, উল্লাপাড়ার যে ঘরটিতে পূর্ণিমাকে এনে তোলা হয়েছে, সেখানে ওর হাতটি ধরেছিলাম। দেখি ধরেই আছে। আমি আরেক হাতে ওর হাত চেপে ধরলাম। ১৫ কী ১৬ বছর হবে তার। নিতান্ত গরিব ঘরের মেয়ে। ক্লাস টেন-এ পড়তো। উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রামে গত ৮ অক্টোবর [সাল ২০০১] সন্ধ্যারাতে তাকে তুলে নিয়ে যারা ধর্ষণ করেছিল, তারা নাকি একই গ্রামের লোক। ধর্ষিতার পক্ষে ওইরকম অবস্থায় ঠাওর করা সম্ভব নয় ঠিক কতজন কিংবা কারা তাকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু কারা তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তা পূর্ণিমা দেখেছে, দেখেছে অন্যরাও। এত ভয়ংকর আঘাত সে সইছে কী করে, কেবলই ভাবছিলাম। হাত ছেড়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম। চুলে তেল দিয়েছে। এদেশের যে বাবা-মা ওকে জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁরা কী অপরাধ করেছিলেন যে, একটি নির্বাচনের পর তাঁদের এই কিশোরী মেয়েটিকে এভাবে 'শাস্তি' পেতে হল?

এখানে লক্ষ করবার, এক. পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করেছিল তার গ্রামেরই লোকজন। নোয়াখালির গৃহবধূকে প্রতিরাতে তুলে নিয়ে যেত তাঁর গ্রামেরই লোকজন। পুকুরঘাটে স্নান করতে-আসা মেয়েটিকে ছড়া কেটে সন্ত্রস্ত করত তাঁর গ্রামেরই খেলার সাথী বা গুরুজন। সব মূল্যবোধ ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধর্ষণকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'কমনম্যান'দের মধ্যে। দিয়েছে দলতন্ত্র, যা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রশক্তি। দুই. 'একটি নির্বাচনের পর'— ২০০১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়। বিএনপি জোট জয়ী হয় তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়। ফল ঘোষণার পরই নজিরহীন ভয়াবহ আক্রমণ নেমে আসে পরাজিত দল আওয়ামি লিগের ভোটব্যাংক বলে কথিত সংখ্যালঘু শ্রেণির ওপর। 'নজিরহীন' বলেছেন বাংলাদেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিক সুধীজনেরা। পাকিস্তান আমলেও এরকম আক্রমণ হয়নি। এটা ছিল বিরোধীদের নিকেশ করে দেওয়ার ফ্যাসিস্ট নকশা। যার শিকার কিশোরী পূর্ণিমা।

এরপর হাসান মামুন লেখেন, বুক ঠেলে গলায় এসে আটকে রইল এক গভীর অচেনা অপরাধবোধ। যারা পূর্ণিমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই ছিল মুসলমান। এদেশের সংখ্যাগুরুদের কয়েকজন। আর পূর্ণিমা দেশের সংখ্যালঘুদের একজন এবং এক গরিব ঘরের অসহায় কিশোরী। এরকম একটা ভয়ংকর বিভাজনের মধ্যে চলে গিয়েছি আমরা। আর কিছু হিংস্র মনোভাবের মুসলমান সাহস পেয়েছে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার। যেন জানতই, কেউ বাধা দেবে না। বাধা পেয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলেও কিচ্ছু হবে না। থানায় গেলেও মামলা হবে না। প্রশাসন বলবে, ধর্ষণ তো হয়নি, 'টানাহ্যাঁচড়া' হয়েছিল। সরকার অস্বীকার করবে সত্য। উপরন্তু ধর্ষণের 'সামান্য' ঘটনা নিয়ে 'বাড়াবাড়ি' হলে

তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হবে, শহরে কিংবা ওপারে কোথাও।

'সামান্য' আর 'বাড়াবাড়ি' শব্দ দুটো কি মনে করিয়ে দেয় বানতলা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, কাটোয়া, কামদুনি, মধ্যমগ্রামের পিশাচকীর্তির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষশাসকের 'সম্ভাষণ'?

ধর্ষণ দলতন্ত্রের অস্ত্র, রাষ্ট্রযন্ত্রের সন্ত্রাস।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'নির্যাতনের দলিল'-এর [প্রকাশ ২০০২] 'ভূমিকা' অপমানে লজ্জায় বেদনায় উচ্চারণ করে: 'স্বাধীন বাংলাদেশ, যুদ্ধ করে জেগে-ওঠা একটি জাতি এবং সকলেই বাঙালি— আর সেই বাঙালিরই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দু মা ও বোনকে দল বেঁধে ধর্ষণ করে বেড়াচ্ছে মহা উল্লাসে, এমন নারকীয়তা কি কোনও সভ্য সমাজের মানুষ ভাবতে পারে?'

কিন্তু, এই নারকীয়তা শুধু সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কোনও গ্রামে চড়াও হয়ে পিশাচরা যখন দেখে হিন্দুরা সব চলে গিয়েছে, তারা ঢুকে পড়ে স্বধর্মীয়দের ঘরে। রেহাই পায় না স্বধর্মীয় মায়েরা বোনেরা। ক্যান্সার দ্রুত ছড়ায় সমাজদেহে। হুমায়ুন আজাদ লেখেন, 'বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে ধর্ষণপ্রবণ সমাজের একটি; মনে হচ্ছে পৌরাণিক দেবতারা আর ঋষিরা দলবেঁধে জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশে। ধর্ষণের সব সংবাদ অবশ্য জানা যায় না; সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ধর্ষিতারাই তা চেপে রাখে; কিন্তু যতটুকু প্রকাশ পায় তাতেই শিউরে উঠতে হয়। বাংলাদেশে ধর্ষণ সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক কর্মকাণ্ড, পৃথিবীতে যার কোনও তুলনা মেলে না। বাংলাদেশে এককভাবে ধর্ষণ করা হয়, এবং দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়; এবং ধর্ষণের পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়। এখানে পিতা ধর্ষণ করে কন্যাকে (কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এক পিতা ধর্ষণ করে তার তিন কন্যাকে), জামাতা ধর্ষণ করে শাশুড়িকে, সহপাঠী ধর্ষণ করে সহপাঠিনীকে, আমলা ধর্ষণ করে কার্যালয়ের মেথরানিকে, গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করে ছাত্রীকে, ইমাম ধর্ষণ করে আমপারা পড়তে আসা কিশোরীকে, দুলাভাই ধর্ষণ করে শ্যালিকাকে, শ্বশুর ধর্ষণ করে পুত্রবধূকে, দেবর ধর্ষণ করে ভাবীকে; এবং দেশ জুড়ে চলেছে অসংখ্য অসম্পর্কিত ধর্ষণ। চলছে দলবদ্ধ ধর্ষণ;— রাতে গ্রাম ঘেরাও করে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে গৃহবধূদের (কয়েক বছর আগে ঠাকুরগাঁয়ে ঘটে এ-ঘটনা); নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে হত্যা করে একটি বালিকাকে, ১৯৯৫-এর আগস্ট মাসে, দিনাজপুরে, যার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা শহর, এবং প্রাণ দেয়, সাতজন; মহাবিদ্যালয়ে প্রেমিকের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছাত্ররা দলগতভাবে ধর্ষণ করে ছাত্রীকে (ব্রজমোহন কলেজ, ১৯৯৫); মাস্তানরা বাসায় ঢুকে পিতামাতার চোখের সামনে দলগতভাবে ধর্ষণ করে কন্যাদের (বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে)। বাংলাদেশ আজ ধর্ষণকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। (নারী, তৃতীয় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০৩)

অবরোধ ভাঙতে প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রাণ যাচ্ছে। হুমায়ুন আজাদ নিহত হয়েছেন দক্ষৃতীদের আক্রমণে। প্রতিবাদ থেমে নেই।

৩

কুন-অ বদল নাই গ-অ?

অবরুদ্ধ আমাদের এই বাংলাও।

এখানেও প্রতিবাদ হচ্ছে। কৌরবসভার খ্যা খ্যা পিশাচস্বর ছাপিয়ে, দলতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্যাতন সহ্য করে, দলদাস অন্নদাস ভয়দাস কুরুবৃদ্ধ ও কুরুবীরদের মৌনতাকে পরিহাস করে প্রতিবাদী মিছিল বেরোচ্ছে প্রবীণ নবীন শুভবুদ্ধির শুভচেতনার। যাবতীয় অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শাসকবাহিনী। চরম ঔদ্ধত্যে প্রতিবাদকে শাসাচ্ছে : কামদুনি করে দেব। মানুষ দেখছে, কাল যারা ধর্ষণের বিরুদ্ধে বলেছিল, আজ তাবা ধর্ষকের শুভাকাঙ্ক্ষী!

একটি রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেস নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। 'তিতাস' ও 'যুক্তি তক্কো' করে বসে আছেন। সাল ১৯৭৪। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ছবি করা থেকে পালিয়ে গেলেন কি? জবাব দেন ঋত্বিক, 'একেবারেই না। করছি তো। ওই ১৯৭৪-এই তো বলেছিলাম, নবদ্বীপের একটি মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া, দারুণ কনট্রাস্ট— ওই নবদ্বীপেই সেই নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, তার অপরাধ সে রূপসী এবং গরিব ঘরের মেয়ে। কয়েকজন মস্তান তার পেছনে লাগে এবং সে আত্মহত্যা করে। এইটুকুই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু যেটা বেরোয়নি, সেটা আমি এক সাংবাদিকের কাছে জেনেছি, যে ওখানেই থাকে, মেয়েটি মোটেই আত্মহত্যা করেনি, শি ওয়জ রেপ্ড্ অ্যান্ড বার্নড্ টু ডেথ।' এই ধর্ষণ ও হত্যা সেই সময়ের শাসকদলের কোনও বীরপুঙ্গবের কীর্তি!

সেদিন যারা ধর্ষকের হিতকারী ছিল, আজ ক্ষমতার লাঠি খুইয়ে সেজেগুজে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিলে ঢুকে পড়ে।

রাষ্ট্রযন্ত্র বরাবরই ধর্ষণের গুরুঠাকুর! লম্বা ইতিহাস আছে দুর্যোধন-দুঃশাসন-কর্ণদের। তারই একটি টুকরো ছবি হয়ে আছে যা কখনও ভোলা যাবে না। সেখানে রাষ্ট্রশক্তি যদিও প্রত্যক্ষত অনুপস্থিত, তার প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরকালের ভাষা পেয়েছে। মণিপুরের মায়েরা নিজেদের শরীর বিবস্ত্র করে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন প্ল্যাকার্ড হাতে: হে মহান ভারতের সৈনিকগণ! আমাদের ধর্ষণ করো। আমাদের কন্যাদের রেহাই দাও। শান্তিশৃঙ্খলার নামে ইন্ডিয়ান আর্মি মণিপুরের মেয়েদের রেপ-এ মেতেছিল। রাষ্ট্রের প্রতাপ, যখন দেশ স্বাধীন। পরাধীন পর্বের কথা অনেকটাই জানা যায় না। যেটুকু জানা যায়, সেখানে এক পুলিশ অফিসারের কথা আছে। না, সাহেবসুবো নয়, 'নীলদর্পণ'-এর রোগ

সাহেবের আত্মীয়টাত্মীয় নয়, বিশুদ্ধ বঙ্গীয় শয়তান, নাম নলিনী রাহা, সিআইডি দারোগা। বিয়াল্লিশের আন্দোলন চলছে। স্বাধীনতার দাবিতে মেদিনীপুরের মানুষ লড়াইয়ে নেমেছে। সংগ্রামে কোণঠাসা ব্রিটিশ প্রশাসন। সেই সময় নলিনী রাহা মহিষাদলের গৃহবধূ সিন্ধুবালা মাইতিকে ধর্ষণ করে। উইথ এ ব্যান্ড অফ আর্মড ট্রুপস। সিন্ধুবালার অপরাধ তাঁর স্বামী সত্যাগ্রহী। দু দফায় ধর্ষিত হন তিনি। ১৯৪২-এর অক্টোবরে এবং ১৯৪৩-এর জানুয়ারিতে। অত্যাচার সহ্য করতে পারেননি সিন্ধুবালা। রক্তক্ষরণে মারা যান। পুলিশ ও মিলিটারি সঙ্গে নিয়ে নলিনী ধর্ষণ করেছে মহিষাদলের আরও চার নারী— খুদিবালা পণ্ডিত, সুবাসিনী দাস, স্নেহবালা বেওয়া ও রাইমণি পারিয়াকে। স্বাধীনতার লড়াই ঠেকাতে ধর্ষণের সন্ত্রাস!

ইলা মিত্রের কথা বলি। কৃষকের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। আমারই একটি লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : '১৯৫০-এর জানুয়ারি। তোমাকে গ্রেপ্তার করে জেল নিয়ে যাওয়ার পথেই মারধর করে পুলিশ। স্বীকারোক্তি না দিলে তোমাকে নগ্ন করে অত্যাচারের হুমকি দেয় জনৈক এসআই। নিছক হুমকি ছিল না সেটা। সেল-এ ঢুকিয়ে তোমাকে নগ্ন করে ফেলে রাখে। খাবার দেয়নি, জলও নয়। সন্ধেবেলা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় মেরেছে তোমাকে। কথা বলানোর জন্য। নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে। একটি কথা বলোনি তুমি। মধ্যরাতে সেল থেকে বের করে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটি কামরায়। দুটো লাঠির মধ্যে তোমার পা ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাষ্ট্রের লোকজন আমোদ পাচ্ছিল। ওরা বলছিল 'পাকিস্তানি ইনজেকশন'। তোমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। নির্যাতনের আর্তনাদ যেন বাইরে না যায়। হয়তো কিছুটা লজ্জা ছিল ওদের। ... তোমাকে কিছু বলাতে না পেরে তোমার চুল উপড়ে নিয়েছিল। ধরাধরি করে ওরা তোমাকে তুলে সেল-এ নিয়ে ফেলল। তুমি হাঁটতে পারছিলে না। কিন্তু তোমাকে কথা যে বলাতেই হবে। এত সহজে তো হার মানে না রাষ্ট্র। তোমার যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় গরম সেদ্ধডিম। তুমি জ্ঞান হারাও। পরদিন সকালে, জ্ঞান ফিরলে, সেই এসআই আর তার সেপাই বুটপায়ে লাথি মারতে শুরু করে তোমার পেটে। ডান পায়ের গোড়ালিতে পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তবু একটি কথাও বলোনি। আবার এল রাতে। এবার ধর্ষণ করে জবান আদায়। তুমি মুখ খোলোনি। অত্যাচারে সংজ্ঞাহীন হলে। জ্ঞান ফিরল তীব্র যন্ত্রণায়, রক্ত ঝরছে, রক্তে ভিজে পড়ে আছো তুমি, জ্বরে পুড়ছে শরীর। তোমাকে দিয়ে জবরদস্তি একটা সাদা কাগজে সই করিয়ে নিল ওরা।' ('রক্তমেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আজও' গল্প থেকে)

'পাকিস্তানি ইনজেকশন' আরও ভয়াবহ চেহারায় দেখা গেছে ইন্ডিয়ার সমাজসচেতন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত বাম শাসনে। সাল ১৯৯০, তারিখ ৩০ মে। ঘটনাস্থল বানতলা। সেই সময়ের শাসকদলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন ইউনিসেফ-এর দিল্লি অফিসের অফিসার রেণু ঘোষ, রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিবার কল্যাণ শাখার কর্মী অনীতা দেওয়ান ও উমা ঘোষ। ধর্ষিতা হন তিনজনই। তিনজনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গে ও নিম্নাঙ্গে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। মারা যান অনীতা দেওয়ান। তাঁর যৌনাঙ্গে ধাতব টর্চ প্রবিষ্ট ছিল। ইন্টেরোগেশন হ্যাজ অলসো রিভিলড দ্যাট এ পেন্সিল টর্চ ওয়জ থার্স্ট ইনটু দা ভ্যাজাইনা অফ ওয়ান অফ দা উইমেন। আরও মারাত্মক ঘটনা, ধর্ষণের চিহ্ন লোপাট করতে হাসপাতাল থেকে অনীতার দেহ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। অভিযোগ, সেই সময়ের তথাকথিত এক বাম মন্ত্রীর নির্দেশে এটা করা হয়। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বানতলার ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এরকম তো কতই হয়!' সামান্য ব্যাপার আর কী!

এরকম 'সামান্য' ঘটনা কত না ঘটেছে তথাকথিত বাম শাসনে। নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চ ২০০৭-এর একটি 'সামান্য' ঘটনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে ধর্ষিতার বয়ানে। মহিলার নাম কাজল মাঝি। বয়স ৩৬। স্বামী বিকাশ মাঝি। গ্রাম কালীচরণপুর। ঘটনাস্থল গোকুলনগর। কাজল মাঝি জানিয়েছেন, আমি জমায়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। পুজোর জায়গায় বসেছিলাম। যখন পুলিশ এসে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে লাগল, আমি চোকে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি তাই নড়াচড়া না করে ওখানেই বসে থাকি। এরপর ওরা গুলি চালাতে শুরু করে, আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। ওরা আমাকে ধরে ফেলে। বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যখন জ্ঞান ফেরে, তখন দেখতে পাই, একটা গোয়ালে পড়ে আছি। আর বুঝতে পারি যে, আমাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমার জামাকাপড় ছেঁড়া, বুকে আর যৌনাঙ্গে ব্যথা, গায়ে কালশিটে। আমি বুঝতে পারি যে আমাকে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমি একটা খালি গোয়ালে পড়েছিলাম। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এখানে আসতে সাহায্য করে।

কাজল মাঝির জেলার জঙ্গলমহলে সোনামুখী গ্রামের বাসিন্দা সরস্বতী মুর্মু। বয়স ৫১। গভীর রাতে মাওবাদী ধরতে এসে যৌথবাহিনী গ্রামের প্রায় সব মহিলাকে ধর্ষণ করে। যৌথবাহিনীর এই নিগ্রহ আদিবাসী মেয়েদের ললাটলিখন হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ্যে বলে না, লজ্জায় এবং ভয়ে। সরস্বতী মুর্মু এই লজ্জা আর ভয়টা মানতে চাননি। তিনি চিৎকার করে বলেন, আমার ছেলের বয়সী একটা পুলিশ আমাকে ধর্ষণ করেছে। বড়ো জোর কুড়ি-বাইশ হবে ছেলেটা। রাজ্যে তখন তথাকথিত বাম শাসন। তাদের আঞ্চলিক নেতারা যাবতীয় রাজনৈতিক কায়দায় গ্রামের মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, ওসব বলতে নেই। তাহলে পুলিশ হাজতে ভরে দেবে। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দেবে। জীবনে আর ছাড়া পাবে না। গোটা গ্রাম বুঝে গেল, লজ্জা আর ভয়ে চুপ হয়ে গেল। শুধু সরস্বতী তাঁর কথা থেকে নড়তে নারাজ। ফলে জেল। মামলা। সরস্বতীর টাকা নেই যে মামলা লড়বে। রাজ্যে সরকার পাল্টাল। কয়েকজন নাগরিক অধিকার কর্মীর চেষ্টায় জামিন পেলেন সরস্বতী। এগারো হাজার টাকার বিনিময়ে। আবার তাকে তুলে নিয়ে গেল পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসা পরিবর্তনের সরকারের পুলিশ। কারণ, রাষ্ট্রদ্রোহী বয়ানটা তো রয়েই গিয়েছে। সরস্বতী বয়ান বদল করেননি। বলেননি যে, কোনও পুলিশ তাঁকে ধর্ষণ করেনি। এই লেখা লিখতে লিখতে খবর নিয়ে জেনেছি, সরস্বতী মুর্মু এখন হাজতে। জামিনের চেষ্টা চলছে। সহৃদয় আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়ছেন। কিন্তু

জামিন পেতে কয়েক হাজার টাকা লাগে যে। যিনি খাবার জোটাতে পারেন না পয়সার অভাবে, তিনি কয়েক হাজার টাকা পাবেন কোথায়? জিজ্ঞেস করেছিলেন সরস্বতী, কুন-অ বদল নাই গ-অ?

যৌথবাহিনী খ্যা খ্যা হাসে। হোমগৃহে শেয়াল ডেকে ওঠে। সেই শব্দ শুনে ডাকে গাধা আর ভয়ংকর রাতপাখিরা।

৪

দলতন্ত্র আর ভোগবাদের মার?

'ভালোমানুষ' নাটকে একটা সংলাপ আছে। ব্রহ্মা বলছেন, 'বৎস শান্তাকে আমরা খুঁজে বাহির করিবই। যদি না পারি, বিষ্ণু ও মহা [মহেশ্বর] কী করিবে আমি জানি না। কিন্তু আমি সৃষ্টিকর্তার পদ হইতে নিঃসন্দেহে পদত্যাগ করিব। এই কি পৃথিবী! চারিদিকে কেবল দুঃখ কষ্ট অশ্লীলতা এবং ক্ষয় আর নষ্ট এবং নষ্ট আর ক্ষয়। শুনিয়াছিলাম শহরগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, গ্রামগুলি এখনও ভালো আছে কিন্তু আপন চক্ষেই তো গ্রাম দেখিলাম। কোথায় সে সৌন্দর্য, কোথায় সরলতা? (পৃ. ২৬৮, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড)

কমবেশি ৪০ বছর আগেকার সংলাপ। ব্রহ্মার চোখে তখনই স্পষ্ট, গ্রামগুলোও পচে গিয়েছে।

তবু পোলিটিকাল ফিকিরে গ্রামের ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি স্বাস্থ্যের ছবি ছেপে যায় শাসক— ডান বাম জামা গায়। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বা মা মাটি মানুষ ইত্যাদি ঢপ্‌লায়।

মিডিয়া সাধারণত গ্রাম-মফস্‌সলের খবরকে ফৌজি চুলের কাটিং দিয়ে থাকে। নেই, তবু আছে। কারণ গ্রাম-মফস্‌সলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকদের বাস। তাদের খবর পাবলিক তেমন খায় না। অবশ্য অন্যরকম যে একেবারে হয় না, তা নয়। জঙ্গলমহলে কিষেণজির খুনখারাবির খবর লিড স্টোরি বানিয়েছে মিডিয়া, আবার কিষেণজিকে খুনের খবর সুপারলিড-এর ট্রিটমেন্ট দিয়েচে। মোদ্দাকথা, যা কিছু ব্যবসা দেয়, মিডিয়া তা লুফে নেয়। এখন তো ব্যবসা দিচ্ছে গ্রাম-মফস্‌সলই। পাড়ুই, খয়রাশোল, লাভপুর, বোলপুর, কাটোয়া, মেদিনীপুর, বারাসত, মধ্যমগ্রাম— কোথায় নয়। চারদিকে অশ্লীলতা, নষ্ট আর ক্ষয়। রোজ ধর্ষণ আর মৃত্যুর খবর, আর লাগাতর কামশক্তিবর্ধক বিজ্ঞাপন।

ক্ষমতার বৃত্তে থাকা লোকজন ধর্ষণ করে, ধর্ষণে উসকানি দেয়, ধর্ষণের ঘটনা চাপা দেয়, ধর্ষিতকে ভয় দেখায় এবং তেমন হলে মেরে ফেলে, ধর্ষণকারীকে আড়াল করে— এ সবের ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন নয়। কোনো নেতা বলতে পারে, ঘরে ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে রেপ করে দেব। কোনো নেতা বলতে পারে, লাইফ হেল করে দেব। লালগড়ের ছোটপেলিয়া গ্রামের নিগৃহীত লাঞ্ছিত ছিতামণি মুর্মু আরও লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেতে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হয়, ভালো আছি, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিচ্ছি। পুলিশের কাছে অভিযোগ করার দায়ে কোনও তরুণীকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বর্ষশেষের প্রমত্ত রাতে কোনও ধর্ষিতার দেহ তড়িঘড়ি লোপাটের চেষ্টা হয় প্রশাসনের তরফে। সেই ঘটনায় অপরাধীদের আদালত শাস্তি দিলে তারও ক্রেডিট নেয় শাসকরা, যারা দগ্ধ তরুণীর বয়ান নিতে নিষেধ করেছে পুলিশকে। ধর্ষিত ও নিহতের পরিবারে চাকরি দিয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ ভেঙে দেওয়া হয়। এরকম করাটাই ক্ষমতার ধর্ম। ক্ষমতা বলতে পারে, যেমন জানা গেল, জলপাইগুড়ির এক তৃণদাদা বলেছেন, সমাজ যতদিন থাকবে, ততদিন ধর্ষণ থাকবে এবং ধর্ষণ যত প্রচার পাবে, আমাদের দলে কর্মীসংখ্যা তত বাড়বে। এই না হলে ক্ষমতা!

কিন্তু একজন গরিব মানুষ, প্রান্তিক মানুষ তারই মতো গরিব, প্রান্তিককে ধর্ষণ করে কীভাবে? হতে পারে, ধর্মীয় উন্মাদনা দিয়ে অন্ধ করে দেওয়া যায়, শত্রুসম্পত্তি দখলে উন্মাদ করে তোলা যায়, রাজনৈতিক বৈরিতা তৈরি করে কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত করা যায়। কিন্তু যখন ধর্মের হানাহানি নেই, শত্রুসম্পত্তি দখলের মওকা নেই, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষতাও নেই, তখন কীভাবে একজন দিনমজুর, একজন ফেরিওলা, একজন জোগাড়ে, একজন আইসক্রিমওলা বা বাজারের সব্‌জিওলা, একজন রিক্‌শাওলা তারই মতো দরিদ্র ও প্রান্তজনের ঘরের মেয়ের ওপর চড়াও হয়? প্রথাগত সামাজিক সংস্থান অনুসারে, একজন ফেরিওলা ও একজন জোগাড়ে বন্ধুস্থানীয়। শ্রেণিতত্ত্ব অনুসারে, একজন আইসক্রিমওলা একজন দিনমজুরের শ্রেণিমিত্র। কিন্তু এই বন্ধনগুলো, সম্পর্কগুলো, অবস্থানগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কীভাবে? পাড়াগত পারস্পরিক বিশ্বাস ও সামাজিক অনুশাসনের এতটা অধঃপতন হল কীভাবে? গ্রাম-মফস্‌সল পচে গেল, হেজে গেল। সে কি গত সাড়ে তিন দশকের একচ্ছত্র দলতন্ত্রের পরিণাম, যা পাড়ায় পাড়ায় বুককাঁপানো ধ্বজা উড়িয়েছিল? ভিন্নস্বরের টুটি টিপে ধরেছিল? ক্ষমতার অলিন্দে সংখ্যার ঔদ্ধত্যে অস্বীকার করেছিল অলিন্দের বাইরে অসংখ্যের অস্তিত্ব? এই 'বাম নামী' ভণ্ডামি আর গুন্ডামির সঙ্গে জোড় বেঁধেছে উদার অর্থনীতির ভোগবাদ, যা ফ্যাশন-বিবশ মেয়েদের প্রকট সেক্সলাইনের অহরহ বিজ্ঞাপনে কামস্পৃহা কেবলই উগ্র করে এবং সব মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে নাগালে নরম লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উসকানি দেয়।

দুর্যোধন উরুর কাপড় সরিয়েছিলেন। এখন তো প্রায় সবটাই গা খোলা!

তবে, অনেক অন্ধকারের মধ্যে অল্প অল্প আলো ফুটছে। ক্ষমতাকে চ্যালেন্‌জ করা বিকল্প ইডিয়ম ধীরে হলেও তৈরি হচ্ছে। মূল্যবোধের শব্দগুলি রগড়ের খোরাক হয়ে গিয়েছে, সেদিনের প্রতিবাদীরা আজ রাজার জামাই, উরুর কাপড় আপাতত গুছিয়ে দুর্যোধন বসছে বিদ্বজ্জনদের গা ঘেঁষে। তবু আক্রান্তদের মিছিল হাঁটে মেদিনীপুরে ডায়মন্ডহারবারে, বারাসতে যাদবপুরে। মিছিলের উচ্চারণ : সুটিয়া থেকে কামদুনি/ যারা শাসক তারাই খুনি।

[লেখাটি প্রথম ছাপা হয় ‘জনস্বার্থ বার্তা’ শারদ সংখ্যা ২০১৪-য়। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে মনে হল, আরও কয়েকটা কথা বলবার আছে। সংযোজন করা গেল। পরিমার্জনও হল। লেখাটি সংশোধিত চেহারা পেল।— লেখক]